Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ-ভাষা

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নরেন বিশ্বাস
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.8
Pages	211-228
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ-ভাষা

নরেন বিশ্বাস

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারী লেখকবৃন্দ একদা যেমন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাঙলা ভাষায় প্রথম সমাজ-ধর্ম বা তত্ত্ব-বিষয়ক বিচার-বিতর্কমূলক প্রবন্ধের প্রবর্তন করেন, তেমনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত বিশিষ্ট সাহিত্যপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ লেখক বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচনার একটি নোতুন পর্বের সূচনা করেন। রামমোহনের পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে বিশেষত বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন-ইতিহাসের অম্লান প্রভাব ও প্রসার-হেতু শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণীর মানস-ভূগোলের এক ব্যাপক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে য়ুরোপীয় সাংস্কৃতিক-চেতনাস্নাত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে আলোড়িত শিক্ষিত-শ্রেণী বিচিত্র বিষয়ে হয়ে ওঠে অপরিসীম কৌতূহলী। এতোদিনকার দেখা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জাগে নোতুনতর জিজ্ঞাসা, উত্তর অন্বেষায় তাঁদের আগ্রহ আন্তরিক হয়ে ওঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা প্রশাখায়। ফলে তাঁদের এই বিচিত্র বিষয়-জিজ্ঞাসার সরণী ধরে বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রচিত হতে থাকে রামমোহন প্রবর্তিত ধারা-অতিক্রমী বিচিত্র প্রবন্ধরাজি।

এ সময়ের সর্বাধিক উল্লেখ্য পত্রিকা "তত্ত্ববোধিনী"কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রবন্ধকার রচনা করেন—বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ। বাঙালীর চিন্তা-চেতনা, ধী-শক্তির উৎকর্ষবিধানে কিংবা এক কথায় বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির নবরূপরেখা নির্মাণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভূমিকা সত্যি বিস্ময়কর। কারণ এ পত্রিকার যেমন একদিকে প্রকাশিত হতে থাকে রামমোহন প্রবর্তিত

হিন্দু-ধর্ম সংস্কারমূলক তত্ত্বনিষ্ঠ, ধর্ম ও দর্শনাশ্রয়ী সরস প্রবন্ধ (দেবেন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ লেখক), তেমনি পাশ্চাত্য মানবতাবাদের (Humanism) আদর্শে প্রাণিত মানবকল্যাণময় জীবনধর্মী নিবন্ধসমূহ (অক্ষয়কুমার দত্ত) এবং সমাজের তাবৎ কুসংস্কার ও মানবতাবিরোধী জীবনবিমুখপ্রথা উচ্ছেদ-কল্পে বহুবলিষ্ঠ বক্তব্য-সম্পন্ন সামাজিক প্রবন্ধাবলী (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)। ফলে এ পর্বের প্রবন্ধে বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী বহুবর্ণিল ভাষাও নির্মিত হয়েছে যুগপৎ। বস্তুত বাঙলা প্রবন্ধ-ভাষা এই পর্যায়েই সর্বপ্রথম বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার কৈশোরিক দুর্বলতা ; অপরিণত, অপুষ্ট, আড়ষ্ট গতিহীন গদ্যভাষা এই প্রথম জঙ্গম-জীবন-চেতনায় জাতীয় জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি-প্রকাশে সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। রামমোহন পর্বের প্রবন্ধ-ভাষার বাঙলা গদ্যের গতির যে লাবণ্য ছিলো অনায়ত্ত, অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ কিংবা বিদ্যাসাগরের রচনায় সে গতি-ছন্দ হয়েছে সাবলীল ভাবে করায়ত্ত। এবং এঁদের প্রবন্ধ-ভাষা প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রথম শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত, যথার্থ সাহিত্য-ধর্মে ভাস্বর।

অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবন-চরিত, রাজনীতি, সমাজ-দর্শন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখে বাঙলা প্রবন্ধের বৈচিত্র্য ও বিস্তারকে ত্বরান্বিত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সত্যসন্ধ এই শিক্ষক একাধারে সাঙ্গীকৃত করেছিলেন যেমন প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মনীষাকে তেমনি অঙ্গীকার করেছিলেন প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক চেতনাকে। উদার-মানবিকতাবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও পরে সম্ভবতঃ নিরীশ্বরবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।[১] তিনি ১৮৪৩-১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। ফলে তৎকালের তত্ত্ববোধিনী ব্রাহ্ম-ধর্মের বিস্তারে প্রবর্তিত হলেও বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে ওঠেনি। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা-মুক্ত মানবকল্যাণে নিবেদিত এ পত্রিকায় পত্রস্থ হতো বিচিত্র মতাদর্শে অনুপ্রাণিত লেখকের উৎকৃষ্ট রচনা।

ফলে অক্ষয়কুমারের সম্পাদিত পত্রিকায় এবং রচিত প্রবন্ধে সর্বত্র দীপ্র হয়ে ওঠে তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তের প্রতিফলন এবং প্রজ্ঞা পরিচালিত আত্মপ্রত্যয়। যেহেতু দেশ ও জাতির এক ক্রান্তি লগ্নকে শিরোধার্য করে

তাঁর প্রাবন্ধিক জীবনের শুরু, সে-জন্যেই বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষা সঞ্জাত প্রবন্ধাবলীতেও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত হয়েছে জাতীয় জীবন ও সমাজ, তার সঙ্কট ও সমাধানের সূত্রাবলী। ৬৬ বছরের জীবনকালে তিনি নিরলস শ্রমে ও প্রেমে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর কল্যাণকামনায় জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা নীতি-ধর্মের ব্যাপক প্রসারের জন্যে বেশীরভাগ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দেশ ও জাতির সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিলো তাঁর লেখক-সত্তার মূল উদ্দীপন। তাঁর ক্ষান্তিহীন জ্ঞান-সাধনার সম্যক বিকাশের জন্যেই তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষা, আয়ত্তে এনেছিলেন গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু এবং জার্মান ভাষাকেও। এ জন্যেই তাঁর তাবৎ রচনায় সার্থক সন্নিপাত ঘটেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়মুখী চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়ে খ্যাতিমান অধ্যাপক রেভারেন্ড জন এন্ডারসন বলেছিলেন: 'Akshaya Kumar is Indianising European Science' অর্থাৎ অক্ষয়কুমার য়ুরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতীয় করে তুলছেন।

বাঙলা সাহিত্যে বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হিসেবে অক্ষয়কুমারের খ্যাতি সর্বজন-বিদিত হলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা হয় কবিতার মাধ্যমে ('অনঙ্গ মোহন'—এ কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালে)। পরে কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় তিনি কবিতার কল্পিত ভুবন থেকে নেমে আসেন প্রবন্ধের বন্ধুর-পথে। এবং বাঙলা সাহিত্যের এই অনাবাদী এলাকাকে অক্ষয়কুমার প্রবল পরিশ্রমে শিল্প-সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল ক্ষেত্রে পরিণত করেন। পরিশীলিত বুদ্ধির লালনে, উদার জীবন-দৃষ্টির বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসনে, ভাব প্রকাশের মাত্রাগত সংযমে এবং বিষয়ানুসারী ভাষায় সার্থক ব্যবহারে তাঁর প্রবন্ধ এক নোতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

অসাধারণমেধার অধিকারী এই বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রবন্ধপুস্তক প্রকাশ করেন। ডেবিড হেয়ারকে নিয়ে এ প্রবন্ধে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় অন্তরঙ্গ বর্ণনায় তুলে ধরেছেন, তাঁর কর্মাবলী, বাঙলা-দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়।

এর পরই তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ—১৮৫১ ও ২য় ভাগ—১৮৫৩)। গ্রন্থটি তাঁকে

বাঙলা-ভাষী পাঠকের কাছে বৈজ্ঞানিক চেতনা-সম্পন্ন যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। [এ গ্রন্থটি নর করোটি-বিদ্যাবিশারদ স্কচ লেখক জর্জ কুম্বের (George Combe) The constitution of Man Considered in Relation to External Object গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বলে অনেকের ধারণা, কিন্তু এ দু'গ্রন্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও যথেষ্ট। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ চারুপাঠ (১ম ভাগ—১৮৫৩, ২য় ভাগ—১৮৫৪ এবং ৩য় ভাগ—১৮৫৯) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রবন্ধ সংকলন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয় নিয়ে এ-সমস্ত প্রস্তাব বা প্রবন্ধে তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অন্তরঙ্গ ভাষাভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন—বারিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি—নানা জটিল বিষয়সমূহ। অথচ 'চারুপাঠ' যুক্তির বিন্যাসে, বর্ণনাকৌশলে, সরস ভাষার অনুপম গাথুঁনিতে আজও সত্যসন্ধ পাঠকের 'চারুপাঠই' হয়ে আছে। তিনি ইংরেজ লেখক এডিসনের (Addison)-এর 'Vission of Mirza' নামক গ্রন্থের প্রেরণায় রচনা করেন 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ের ত্রয়ী প্রবন্ধ (বিদ্যাবিষয়ক, কীর্তিবিষয়ক ও ন্যায়বিষয়ক)। অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ভাগ—১৮৭০, ২য় ভাগ—১৮৮৩) রচনা করেন হোরেস হেম্যান উইলসন প্রণীত Sketch on the Relations seets of the Hindus গ্রন্থের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে (এ-গ্রন্থের মৌলিক পরিকল্পনা ও প্রত্যয়গত দিক থেকে দু'জনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বর্তমান)। এ-গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের রচনা শুরু করেও তিনি শেষ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে কতকগুলো প্রবন্ধ সংকলিত করে প্রকাশিত হয় 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' (১৯০১)। এ-ছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত তাঁর বেশ কয়েকটি সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে তাঁর রচনাশক্তির বিশিষ্ট স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কলিকাতার বর্তমান দুরাবস্থা', 'বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা' এবং 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজা-দিগের দুরাবস্থা' ইত্যাদি। আমরা এবারে অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাপঞ্জীর ওপর নির্ভর করে তাঁর প্রবন্ধ-ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে ব্রতী হবো।

তাঁর প্রবন্ধ-ভাষার চারিত্র্য বিচারের পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশে উইলিয়ম কেরী,

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রামমোহন, বিদ্যাসাগর কিংবা বঙ্কিম-চন্দ্রের অবদান যতখানি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয় তাঁর সামান্য অংশও অক্ষয়কুমার কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার প্রতি দেয়া হয়না। অথচ প্রবন্ধ-ভাষার ঋদ্ধি ও বিকাশে এঁদের অবদান নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। ফলে আমরা এতোদিনের উপেক্ষিত প্রবন্ধকার অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা-আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ পরিসরে করতে আগ্রহী। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'ভূগোল' প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সালে। এ-সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি এবং বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ও (১৮৪৭) বের হয়নি। ভূগোলে ব্যবহৃত গদ্যভাষা নিতান্ত নিরীক্ষা-মূলক বলেই সংস্কৃতানুসারী অলঙ্কার-অনুপ্রাস ও উপমাদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (হয়তো কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাষার প্রভাবে)। তবে এ নিরীক্ষামূলক লেখায়ও তাঁর রচনারীতির স্বাতন্ত্র্য অনাচ্ছাদিত। তিনি তাঁর 'ভূগোল' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

> ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্বারা বালক দিগকে সুচারু রূপে শিক্ষাদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ আকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্লেশে বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়াছি।

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের প্রায় ছ' বছর আগে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের এ ভূগোল গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার কিছু প্রাথমিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এর গাম্ভীর্য এবং সাবলীলতা আমাদের বিমুগ্ধ করে। আমরা তাঁর 'ভূগোল' গ্রন্থে বিষয়ের অভিনবত্বে (বাঙলা ভাষায় কোন বাঙালী রচিত ভূগোল ইতঃপূর্বে সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয়নি) যেমন তাঁকে ব্যতিক্রমী লেখক হিসেবে স্বীকৃতি জানাই, তেমনি রামমোহন অতিক্রমী প্রাণবান গদ্যভাষার সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট গদ্যশিল্পীরূপে অভিনন্দন জানাতেও দ্বিধা করিনা।

ভূগোল গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের আর কোন রচনা প্রকাশিত হয়নি। এবং তাঁর এ সময়কার ভাষা-চর্চার কিছু নমুনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে তিনি এ পত্রিকায় সেদিনের বহু-বিতর্কিত স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

> কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস লইয়া যে সমুদায় সমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া স্ত্রীবিদ্যার সপক্ষ-বিপক্ষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহারা নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র ··· করিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে যে-সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল উপহাস করিয়াই আসিতেছেন। ফলতঃ কিরূপ উপায় দ্বারা দেশীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই দর্শাইতে পারেন নাই।[২]

অক্ষয়কুমারের সম্পাদকীয় স্তম্ভের সম্পন্নরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় ১৮৪৩-এ প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। এ পত্রিকার সূচনালগ্নে তাঁর প্রস্তাবনার ভাষা ছিলো :

> কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এ স্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।[৩]

বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁকে প্রতিনিয়ত বিচিত্র-বিষয় প্রকাশ-উপযোগী ভাষার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। তিনিই প্রথম ভাষাকে 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা' মুক্ত করে এক রুচি-সম্পন্ন বৈদগ্ধ্য দান করেন। তাঁর সম্পাদকীয় এবং বক্তৃতার ভাষায় বহু দীর্ঘ মিশ্র বা যৌগিক বাক্য ব্যবহৃত হলেও সে ভাষা যুগপৎ ওজস্বিনী ও প্রাঞ্জল এবং গদ্যের অন্তর্লীন ছন্দে জঙ্গম।

অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'ডেভিড্ সাহেবের বক্তৃতা' প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ সালে। এটি তাঁর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পুস্তক (মাত্র আট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বলে একে পুস্তিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়)। ১লা জুন, ১৮৪৫ সালে ডেভিড সাহেবের তৃতীয় সাম্বাৎসরিক সম্বর্ধনা সভায় (রাম-গোপাল ঘোষের সভাপতিত্বে) তিনি এটি পাঠ করেছিলেন। আকারে ক্ষুদ্র এ গ্রন্থে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে প্রবন্ধকার অক্ষয়কুমারের জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যানুশীলনের প্রবলতর স্পৃহার সমাচার। এবং স্বদেশ ও জাতীয় চৈতন্যের জাগরণ-কল্পে ভাষা এখানে আবেগমণ্ডিত, শাণিত এবং অনেক বেশী লক্ষ্যভেদী।

ক. আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে কলেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান কর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে, — অনুৎসাহ, অল্পপ্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে।

খ. পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন।

এবং এ নিবন্ধে তিনি ডেভিড হেয়ারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এ জন্যে যে,

> তিনি আমাদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।[৪]

এখানে তাঁর ভাষা যতখানি ব্যক্তিচরিত্রের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপক, তার চেয়ে বেশী তাঁর স্বদেশ প্রীতি, বিদ্যানুরক্তি এবং জ্ঞানাসক্তি প্রকাশক। "হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই"—এখানে তিনটি নেতিবাচক প্রস্তাবনার পর তিনি উপস্থিত করেছেন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত —"সহস্রগুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।" সচেতন গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে যে—বাঙলা বাক্যের সবচেয়ে দুর্বলতম দিক্ হচ্ছে তার ক্রিয়াপদ, তাই প্রাগুক্ত বাক্যে 'দান'

ক্রিয়াটির পৌনঃপুনিক প্রয়োগের একঘেয়েমি এড়াতে—'দেন নাই', 'দেন নাই', 'দান করেন নাই' এবং 'প্রদান করিয়াছেন'—এ ধরনের রূপ বৈচিত্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ, ১৮৫১, ২য় ভাগ ১৮৫৩)। এর পরই তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ 'চারুপাঠ' (১ম ভাগ ১৮৫৩, ২য় ভাগ ১৮৫৪, ৩য় ভাগ ১৮৫৯) প্রকাশিত হয়। বলা যেতে পারে এ পর্বেই অক্ষয়কুমার তাঁর রচনায় সামগ্রিক সফলতাকে করায়ত্ত করেছেন। 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ সম্পর্কে তাঁর পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছিলেন :

> "নানারূপ অলীক ধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও পুরাতন পঞ্চতন্ত্র যদি সংস্কৃত সাহিত্যে বহুযুগ ব্যাপিয়া স্থান পাইয়া থাকে, তবে আদর্শের উচ্চতা, ভাষার স্নিগ্ধ মনোহারিতা, বিষয়—বৈচিত্র্য এবং চিত্ত বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতার জন্য চারু-পাঠও যুগ যুগান্ত ধরিয়া বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্য মর্য্যাদার সহিত স্থান পাইবে। বিজ্ঞান ও নীতির শুষ্ক কঙ্কাল বিজ্ঞান-প্রেমিকের অনুরাগ-মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইলে, কতদূর যে মনোরম হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গ ভাষায়—একমাত্র চারুপাঠ।

এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে বাঙলা তথা ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সূচনা। কেরি, ম্যার্শম্যান প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সালে। প্রকাশিত হতে থাকে স্কুল-পাঠ্য বিজ্ঞানের বই। রবার্ট মে রচিত বাঙলা গণিতের বই বের হয় ১৮১৭ সালে। ১৮১৯ সালে হালি-সংকলিত আরেকটি গণিত পুস্তক প্রকাশ পায়। এবং একই বছর উইলিয়ম হপকিন্স পিয়ার্সের ভূগোল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক উইলিয়ম ইয়েটস ১৮২৫ সালে 'পদার্থ-বিদ্যাসার' এবং ১৮৩০ সালে রচনা করেন 'জ্যোতির্বিদ্যা' গ্রন্থ। জন ম্যাক্ ১৮৩৪ সালে 'কিমিয়বিদ্যাসার' নামে বাঙলা ভাষায় প্রথম রসায়ন

বিজ্ঞানের বই লেখেন। তবে উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে প্রকাশিত এ সমস্ত গ্রন্থই রচিত হয়েছে বিদেশীদের দ্বারা, বাঙালী রচিত বাঙলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রামকমল সেনের 'ঔষধসার (১৮১৯)। কিন্তু উল্লেখিত সমস্ত গ্রন্থই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-পাঠ্য এবং নিতান্ত অনুবাদ-ধর্মী বিজ্ঞানচর্চার নামান্তর। বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং সাহিত্যের রস এ দুয়ের সার্থক সন্নিপাতে যে বিজ্ঞানসাহিত্য নির্মিত হয়—তার সার্থক স্থপতি অক্ষয়-কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে তাঁর সেই আত্মিক বিজ্ঞানপ্রীতির স্বাক্ষর সমুজ্জল হয়ে উঠেছে এক সরস গদ্য-ভাষায়। বস্তুত "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানপ্রিয় বাঙালী সাহিত্যিক।" এবং বিদ্যাসাগরের ভাষায় :

> He is one of the very few of the best Bengali writers of the time.[৫]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে—অক্ষয়কুমার যখন গভীর অনুশীলনে ভূগোল, চারুপাঠ, বিজ্ঞান, নীতি ও সাহিত্য-বিষয়ক রচনায় রত, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থসহ মূল উপনিষদের শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যায় নিমগ্ন। অর্থাৎ সমকালের দু'জন গদ্য-শিল্পী কেবল জীবন-চর্চায় স্বতন্ত্র ছিলেন না, জীবন-বেদেও তাঁদের পার্থক্য ছিলো মৌলিক। ১৮৪৩ সালের একই দিনে তাঁরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেও দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিলো ব্রাহ্মধর্ম-এর উৎস বেদ, যে বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদৃষ্ট সৃষ্টি এবং অপৌরুষেয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষ্যে—"বেদ মানুষের রচনা, অপৌরুষেয়, ঈশ্বর প্রত্যাদৃষ্ট হতে পারে না অতএব অভ্রান্তও নয়।" সুতরাং ধর্মচিন্তায় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ব্যবধান ছিলো দুস্তর। দুজনের ধর্মচেতনার এ বৈপরীত্য প্রমাণিত হয় দেবেন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় উক্তিতে :

> ···আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ—পাতাল প্রভেদ।[৬]

ফলে তাঁর ধর্মানুভূতি মূলত মানব-প্রীতির নামান্তর। বিজ্ঞানবোধে সমর্পিত, আজন্ম জ্ঞান-পিপাসু অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করতেন—"মানুষ পার্থিব জীব, তার যা কিছু সম্পর্ক সব পৃথিবীর সঙ্গে, পার্থিব জীব ও জগতের সঙ্গে, সেখানেই তার যত নিয়ম-আচার ধর্ম ও আচরণ; এই তার প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্যত্র নেই।"[৭] তাই তাঁর তাবৎ রচনায় কোথাও জীবন ও ধর্ম ভিন্ন ভাবনায় স্বতন্ত্র শব্দরূপ লাভ করেনি। সে যুগের 'মেটিরিয়ালিস্টিক হিউম্যানিস্ট' অক্ষয়কুমার দত্ত তাই মানব-কল্যাণকামনায় যৌক্তিক পন্থায় অনবদ্য ভাষায় বিবৃত করেন: "দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যকরূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতিপূর্বাবধি নানাদেশীয় নীতি প্রদর্শক ও ধর্ম প্রযোজক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এ বিষয়ের যাহা কিছু হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

আমরা এবারে এই জীবনরসিক গদ্যশিল্পীর বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী গদ্য-শৈলীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণে ব্রতী হবো এবং ভাষার চারিত্র্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর মানস-প্রবণতারও পরিমাপ হবে যুগপৎ।

প্রথমেই উদ্ধৃত করা যাক তাঁর সমাজধর্ম-বিষয়ক রচনার নমুনা; স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> ক. পত্নীকে আপনার ইন্দ্রিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মূঢ়তা ও অসভ্যতার লক্ষণ। রীতিমত শিক্ষাদান দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত, ধর্ম প্রবৃত্তি উন্নত ও কুসংস্কার সকল নিরাকৃত করিয়া তাহাকে পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ দেওয়া উচিত। এবং যাহাতে সেই সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনে তাহার যত্ন ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বামীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[৮]

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর প্রতি অবিবেকী অত্যাচারের প্রতিকার-কল্পে পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন তিনি শাস্ত্রীয় ভাষ্যে নয়, মানসিক নৈতিক বোধের যৌক্তিক বিন্যাসে ; ফলে ভাষা এখানে শ্রেয়োবোধে শাণিত, লেখকসত্তার প্রগাঢ় উষ্ণতায় উদ্ভাসিত।

'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)-এ প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্মীয়-প্রত্যয়ের প্রকৃত স্বরূপ। তাঁর ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মধর্ম স্বাভাবিক ধর্ম, এটা বেদান্ত-দর্শন পরিচালিত কোনো বিশেষ শাস্ত্র-শাসিত ধর্ম নয়। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো মানুষের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আন্তরিক অন্বেষণ। সুতরাং মানবিক প্রজ্ঞার প্রোজ্জ্বল এই প্রাবন্ধিক তাঁর প্রত্যয়কে ব্যক্ত করেন একজন সংবেদনশীল বিজ্ঞানীর শাণিত যুক্তির আলোকে, ভাষায়ও সংযোজিত হয় নোতুন মাত্রা যা রামমোহনে ধরা পড়েনি এবং দেবেন্দ্রনাথে ছিলো দুর্লভ

> খ. অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধজ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্ত্ যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যিশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।[৯]

অর্থাৎ অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান, দর্শন এবং বিশ্বের তাবৎ মহান চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশে মানুষের কল্যাণ অনুসন্ধান করেছেন বলে ধর্মবোধ তাঁর কাছে এক অখণ্ড অফুরন্ত জ্ঞানানুশীলন। এই মহান চেতনায় স্নাত প্রবন্ধকারের ভাষা তাই এতো প্রত্যাশা বিজ্ঞাপক এবং ওজঃগুণ সম্পন্ন। উদ্ধৃতাংশের সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের চলিতরূপ দিয়ে কিছু সংযোজক পদের সংযমী ব্যবহার করলে এ শতাব্দের সমৃদ্ধ গদ্যের সার্থক নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা এবারে অক্ষয়কুমার দত্তের বিভিন্ন রচনা থেকে (বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী) কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর প্রবন্ধের সার্বিক ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে প্রয়াস পাবো।

ক. বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা

১. ঐশ্বরিক বিধান নয় জগৎ ও জীবন-রহস্যের মূলে কার্য-কারণের বৈজ্ঞানিক সূত্র নিহিত :

> সকল কার্য্যের কারণ থাকে। ঈশ্বর শুভাশুভ ফল করেন না কারণানুযায়ী কার্য ঘটে।[১০]

২. জড়ের সংজ্ঞার্থ প্রদানে :

> যে গুণ থাকাতে, জড় পদার্থ আপনা হইতে চলিতে পারেনা এবং অন্য কর্তৃক চালিত হইলে, আপনা হইতে স্থির হইতেও পারেনা, তাহার নাম জড়ত্ব।[১১]

৩. চারুপাঠ, ১ম ভাগে আগ্নেয়গিরির ব্যাখ্যা তাঁর ভাষায় :

> কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণজল ও ধাতু নিস্রব প্রবল বেগে নির্গত হয়। এই সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয় পর্ব্বত।[১২]

খ. নীতি-বিষয়ক রচনা

১. মানুষের প্রকৃতিগুলির যথাযথ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সামাজিক জন্য বিদ্যাপ্রচারই দুঃখনাশ ও সুখবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। দুঃখনাশের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে সাম্যাবস্থায় রাখে। মৃত্যু-ঘটনা ও সমস্ত শারীরিক বস্তু প্রকৃতিসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হবে তাহলে। এই নিয়ম সমুদায় শুভকর।[১৩]

২. অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি (ভুল বানান) হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতার পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না।[১৪]

গ. ইতিহাস-বিষয়ক রচনা

১. প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার (১৯০১, তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পর প্রকাশিত) গ্রন্থের পরিশেষে :

এতদ্বারা আমরা নিশ্চয়ই অবগত হইতেছি যে, অতিপূর্ব্বকালে বেদাদি শাস্ত্র রচনার সময়েও তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুগণ সমুদ্রযোগে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করিয়াও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইত না, জাতিবিভক্ত হইলেও জাতিভ্রষ্ট হইত না।[১৫]

২. শূদ্রকের কৃত মৃচ্ছকটিক এবং কবি কালিদাসের কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রায় প্রচলিত অন্য অন্য সমুদায় সাহিত্যের অপেক্ষা প্রাচীন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের সময়ে শৈব ধর্ম-প্রচার থাকিবার বহুতর প্রদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে।[১৬]

ঘ. বিবিধ

"পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা" বর্ণনায় :

১. হায়! যাহারা কেবল দণ্ড ভয়ে আপনার অনভিমত কার্য্যে এইরূপ নিয়োজিত থাকে,—গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্র ও বর্ষাঋতুর অজস্র বারিবর্ষণ সহ্য করে তাহারদিগের কি বিজাতীয় যন্ত্রণা! তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া হল চালনা করুক হস্তদ্বারা নীলভূমির তৃণ উৎপাটন করুক, নীলপত্র ছেদন করুক, তৎপূর্ণ নৌকাই বা বাহন করুক, তাহারদের অন্তঃকরণ কদাপি সে স্থানে ও সে কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে না। যখন কৃষকেরা নীলকরের নীলক্ষেত্র কর্ষণ করে, তখন তাহারা আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়। স্ব সন্তানবৎ স্নেহাস্পদ বৃক্ষগুলি-স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। সে সময়ে তাহারদের স্বীয় ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কার্য্য সমাধা করিতেই সাবকাশ পায়না সেই সময় তাহার দিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকারপূর্ব্বক অন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় হয়।[১৭]

কবিত্বশক্তিতে, বর্ণনানৈপুণ্যে সাহিত্যগুণ সম্পন্ন গদ্যভাষার দৃষ্টান্ত :

> এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ-খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি, অন্ত, কার্যকারণ, সুখ-দুঃখ, কর্মাকর্ম সমুদায় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল কল্লোলের কলকলধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শরশর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন দুর্বাদল পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ-ক্ষেত্র, কুত্রাপি পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ-সমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দলাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ-দীপ্ত-হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, এবং তদানুসারে দিগ্‌বিদিক বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল, ততদূরেই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।[১৮]

কোন পরিসংখ্যান গ্রহণ না করেও এক নিরীখে বলা যায় যে অক্ষয়-কুমার দত্তের তাবৎ রচনায় তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সর্বাধিক। (উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলো তাঁর বিভিন্ন-বিষয়াশ্রয়ী রচনার ভাষা-বৈশিষ্ট্য-বিজ্ঞাপক) এর পরই তদ্ভব (সংস্কৃতজাত) শব্দের স্থান। দেশী শব্দের মিশ্রণ দুষ্প্রাপ্য। তবে বিষয়ভেদে আমাদের কাছে এ তথ্যটি -- পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক (ঘ-এর ২) রচনায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সর্বাধিক এবং এটিতে সংস্কৃতজাত (তদ্ভব) শব্দের প্রয়োগ সবচেয়ে কম। এবং তার নীতি ও ধর্ম-বিষয়ক রচনায় তদ্ভব শব্দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কিত লেখায় সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের পরিমাণ যেমন কমেছে সংস্কৃতজাত (তদ্ভব) শব্দের অনুপাত তত বেড়েছে। আর বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় তাঁকে বাধ্য হয়ে বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণের জন্যে দ্বারস্থ হতে হয়েছে সংস্কৃত ভাষার। তবে অক্ষয়কুমারের কালকে এবং বাঙলাগদ্যের নির্মীক্ষাপর্বের কথা স্মরণ রেখে এ সত্য উচ্চারণ করা যায়

যে, তাঁর তাবৎ রচনায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও ভাষার মাধুর্য কোথাও বিনষ্ট হয়নি, একটা সহজ বোধগম্যতা তাঁর ভাষাকে ভিন্নতর সুষমা দান করেছে। আসলে তৎসম-তদ্ভব-দেশী-কিংবা বিদেশী শব্দের বিতর্ক-বিচারে ভাষার চারিত্র্য নিরূপিত হয় না, ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সে শব্দ যথাযথ কিনা সেটাই মুখ্য বিবেচনার বিষয়। আমরা এখানে শব্দ ব্যবহারে অক্ষয়কুমারের মানস প্রবণতার দিকটিই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। এবং আমরা এ সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি যে তিনি বিচিত্র প্রবন্ধে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে সর্বাধিক প্রশান্তি পেতেন। এবং তিনি তাঁর আন্তর-অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশে (সর্বাধিক সংস্কৃত শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগে : সাহিত্য বিষয়ক) ভাষায় এক শোভন সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সার্থক। এ বিশিষ্ট ভাষাদর্শে অক্ষয়কুমার দত্ত এক শক্তিমান গদ্যশিল্পীর স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যে দীপ্র।

তাঁর প্রবন্ধ-ভাষায় বিশেষণ প্রয়োগের বিশেষত্ব তাঁকে সে যুগের গদ্য-শিল্পীদের মধ্যে স্বতন্ত্র মহিমা প্রদান করেছে। যেমন—প্রচণ্ড রৌদ্র, অজস্র বারিবর্ষণ, বিজাতীয় যন্ত্রণা, স্নেহাস্পদ শস্য, অযথোচিত বেতন (ঘ. ১), সুস্নিগ্ধ সময়, পরম সুখানুভব, বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে, শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, পুরাতন বৃক্ষ, অপর্য্যাপ্ত আনন্দ (ঘ. ২) ইত্যাদি। তবে তাঁর এই বিশেষণ প্রয়োগ বা ভাষার শব্দ-সাযুজ্য (Collocation) সর্বত্র সুপ্রযুক্ত তা বলা বোধ হয় সমীচীন নয়। যেমন—সুস্নিগ্ধ সময়—এ ব্যবহার অভিপ্রেত নয়,—এখানে সুস্নিগ্ধের পর 'বাতাস', 'আলো' ইত্যাদি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো। স্নেহাস্পদ শস্য, পুরাতন বৃক্ষও অনভিপ্রেত প্রয়োগ। তবে এ ব্যতিক্রমী প্রয়োগে অচেতন পদার্থে চেতন প্রাণীর ধর্ম আরোপের ফলে ভাষায় এক ধরনের অভিনব দ্যুতিময়তার সৃষ্টি হয়েছে। (স্মর্তব্য : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের লেখায়,—'রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে' বা 'প্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ', পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথে এ ধরনের শব্দ-সাযুজ্য—ভাষায় এক ভিন্নধর্মী সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে অনুপম ; যেমন, ক্লান্ত সন্ধ্যা, নীল ঘুম, স্বপ্নের ঢেউ, বোবা অন্ধকার, বিহ্বল বাতাস, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এর বিস্ময়কর প্রয়োগ তাঁর কবি-স্বভাবের স্বতন্ত্র মুদ্রার বিজ্ঞাপক : নরম রোদ, উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতা)। অক্ষয়কুমারের রচনায় কিছু নোতুন শব্দ-সাযুজ্যের (Collocations) ব্যবহার ভাষায় ভিন্নতর সৌন্দর্যের মাত্রা

সংযোজিত করলেও কিছু অবাঞ্ছিত বাড়তি শব্দ উপসর্গের শব্দ-সাযুজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় পরিণামী সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়েছে। যেমন 'গভীর ঘোরতর গর্জন', 'নিবিড় নিস্তব্ধ নির্জন বনখণ্ড', 'অতি প্রচণ্ড বেগ' ইত্যাদি।

তবে তাঁর প্রবন্ধ-ভাষা বিশ্লেষণের মুহূর্তে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তিনি প্রায় সার্ধ-শতাব্দ পূর্বে মাতৃভাষা বাঙলার মাধ্যমে স্ব-ভাষী শিক্ষার্থী এবং স্বদেশবাসীর জন্যে; তাঁদের জ্ঞান-জিজ্ঞাসাকে উদ্দীপিত করার মানসে একজন নিবেদিত গদ্যকারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁকে ভাষা-নির্মাতা ও শিল্প-স্রষ্টার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে যুগপৎ। তখন বাঙলা গদ্য-ভাষা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করেনি, তাঁর সর্বশরীরে বিদ্যমান গঠনপর্ব-জাত বৈশেষিক লক্ষণসমূহ। ফলে তাঁকেও তাঁর কালের প্রচলিত শব্দাবলীর কাছে অনেক ক্ষেত্রে সমর্পণ করতে হয়েছে নিরুপায় হয়েই। [উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, তৎকালের গদ্য ভাষায় ব্যবহৃত 'প্রাদুর্ভাব' শব্দটি, এটি তখন আবির্ভাব অর্থে সর্বাধিক প্রচলিত ছিলো। ফলে অক্ষয়কুমারের রচনার প্রায় সর্বত্র 'প্রাদুর্ভাব' আবির্ভাব অর্থেই ব্যবহৃত। যেমন, "অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির প্রাদুর্ভূত হন" (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়)]।

বাঙলা বাক্যগঠনের সাধারণ স্বাভাবিক ক্রম (প্রথমে কর্তা, তারপর কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া) অক্ষয়কুমারের রচনায় প্রায় সর্বত্র অনুসৃত। যেমন :

ক. "সমুদায় ধর্ম্মই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" (ভা. উ. স. ২১৬)

খ. "তিনি প্রতিদিন জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতেন। (ভা. উ. স. ৩৯)"

গ. "সূর্য্যের রশ্মি পাইয়া চন্দ্র প্রকাশ পায়।" ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার তাঁর প্রবন্ধে সংস্কৃত সমাসের ক্ষেত্রে, সংযোজক অব্যয়ের ক্ষেত্রে, অসমাপিকা ক্রিয়ার (ইতে, ইলে, ইয়া ইত্যাদি) ব্যবহার বৈচিত্র্যে, অনুচ্ছেদ পরিকল্পনার অভিনবত্বে, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার নৈপুণ্যে এবং অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের সার্থক সংযোজনে সে যুগের এক ব্যতিক্রমী গদ্যকার হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দের শুরুতেই বাঙলা গদ্য ভাষায় 'এবং'

এই সংযোজক অব্যয়টির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 'এবং' শব্দটিকে আমরা বাঙলা ভাষায় যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি সংস্কৃতে সে-অর্থে ব্যবহৃত হতো না। সংস্কৃতে 'চ' যে অর্থ বহন করতো বাঙলায় এবং সে-অর্থেই প্রযুক্ত। কিন্তু উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের রচনায় 'এবং'-এর ব্যবহার সংযোজক অব্যয়রূপে সার্থকতা লাভ করেনি। যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'রাজাবলি'তে (১৮০৮) "কান্যাকুব্জ্য দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন।" এখানে দুটো সমাপিকা ক্রিয়ার মাঝখানে 'এবং'-এর প্রয়োগ বাক্যটির আড়ষ্টতার কারণ। কিন্তু অক্ষয়কুমার তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ভূগোল' (১৮৪১) থেকে 'এবং' 'ও' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়ের সার্থক ব্যবহারের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, 'তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপটা এবং এ প্রকার কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়।' (চারুপাঠ, ৩ ভাগ, পৃ. ৫৪)। অর্থাৎ বিজ্ঞান-সাহিত্যে ভাষা-নির্মাতা সচেতন শিল্পী অক্ষয়কুমার প্রাবন্ধিক জীবনের শুরুতেই উপলব্ধি করেছিলেন 'এবং' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয় সাধারণতঃ পদগুচ্ছের (Phrase) মধ্যে কিংবা বাক্যাংশের (Clause) মধ্যে। আবার কোথাও অসমাপিকা ক্রিয়ার মাঝে। তাই তাঁর তাবৎ রচনার ভাষা বিচারে এ সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করা যায় যে,— অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙলা প্রবন্ধ-ভাষার প্রকর্ষবিধানে এক অক্ষয় কীর্তির তর্কাতীত স্থপতি।

তথ্যনির্দেশ

১ বাংলা প্রবন্ধ সংকলন (সম্পাদক : নীলরতন সেন), দ্রষ্টব্য : লেখক পরিচিতি।

২ বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, তৃতীয় ভাগ, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১১৬-১৭

৩ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৭৫

৪ অক্ষয়কুমার দত্ত, 'শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা (১৮৪৫), পৃ. ৭-৮

৫ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১ (১২), পৃ. ২৭

৬ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃ. ৩৭

৭ অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম ভাগ

৮ অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্ম্মনীতি, প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১৮৯৪, পৃ. ৭৭
৯ অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, ১৮৫৫, পৃ. ১৪
১০ অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, পৃ. ২০৩
১১ অক্ষয়কুমার দত্ত, পদার্থবিদ্যা, পৃ. ১৩
১২ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ (১ম ভাগ) পৃ. ৬
১৩ অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম ভাগ,
১৪ প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১২
১৫ অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার (১৯০১). পৃ. ১৭৭
১৬ অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ
১৭ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (৪র্থ ভাগ, ৮১ সংখ্যা, ১৭৭২ শকাব্দ). পৃ. ১১৭-১৮
১৮ অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৯, পৃ. ২